অশোকবিজয় রাহার কবিতা : ছবির জাদু

অমল পাল

অশোকবিজয় রাহার কবিতা পড়তে গিয়ে সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে তার চিত্রধর্মিতা। শব্দের রঙে একের পর এক ছবি ফুটিয়ে তোলেন তিনি। এই ছবি অবশ্য কেবলমাত্র আমাদের দৃশ্যচেতনা জাগিয়ে তুলেই শেষ হয়ে যায় না। তাঁর বলবার কথাও লুকিয়ে থাকে ছবির ভিতরে। অশোকবিজয় নিজেও সচেতন ছিলেন এ বিষয়ে। তাঁর 'হঠাৎ দেখা' কবিতাটি সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেছেন, 'লক্ষ করলে দেখা যাবে এখানে এই পাখির কোলাহল ছাড়া আর সবটাই চোখে দেখার ছবি, —একে বলতে পার আমার রসরূপায়নিক প্রক্রিয়ায় একটি বৈশিষ্ট্য।'[১] অশোকবিজয়ের কবিতায় তাঁর রসরূপায়নিক প্রক্রিয়ার এই বৈশিষ্ট্য শুধুমাত্র একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্যই নয়, বলা যেতে পারে এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই ফুটে ওঠে তাঁর কবির - স্বভাবের যথার্থ স্বাচ্ছন্দ্য।

'শ্রেষ্ঠ কবিতা'র সংকলনটি বাদ দিলে অশোকবিজয়ের কবিতার বইয়ের সংখ্যা দশ। সেগুলি হল, ডিহাং নদীর বাঁকে (১৯৪১); রুদ্র বসন্ত (১৯৪১), ভানুমতীর মাঠ (১৯৪২), জল ডম্বরু পাহাড় (১৯৪৫), রক্তসন্ধ্যা (১৯৪৫), শেষ চূড়া (১৯৪৫), উড়ো চিঠির ঝাঁক (১৯৫১), যেথা এই চৈত্রের শালবন (১৯৬১), ঘন্টা বাজে : পর্দা সরে যায় (১৯৮১), পৌষ ফসল (১৯৮৩)। এই কাব্যগুলিকে তাঁর কবি জীবনের দুটি পর্বের সঙ্গে মিলিয়ে দুটি ভাগে ফেলতে পারি। একটি প্রাক্ - শান্তিনিকেতন পর্ব এবং অন্যটি শান্তিনিকেতন পর্ব। অশোকবিজয়ের জন্ম ১৯১০ সালে, শ্রীহট্টের ঢাকাদক্ষিণ গ্রামে। তাঁর বাল্য, কৈশোর, যৌবন ও কর্মজীবন মিলিয়ে প্রায় চল্লিশ বছর কেটেছে শ্রীহট্ট - কাছাড় অঞ্চলে। ১৯৫১ -তে তিনি শান্তিনিকেতনে অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। ১৯৫১ থেকে আমৃত্যু তিনি থেকেছেন শান্তিনিকেতনে। শান্তিনিকেতনে আমার আগে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর 'ডিহাং নদীর বাঁকে' থেকে শুরু করে 'শেষ চূড়া' পর্যন্ত শান্তিনিকেতনে যোগ দেবার বছরটিতে প্রকাশিত হয় 'উড়ো চিঠির ঝাঁক'। এরপর মৃত্যুর আগে পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে মাত্র তিনটি কাব্যগ্রন্থ। কবি-জীবনের এই সংক্ষিপ্ত তথ্য থেকে একটা জিনিস খুব পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে, প্রথম পর্বটিতেই রচিত হয়েছে তাঁর কবিতাবলির প্রধান অংশ। কেবল পরিমাণের দিক থেকে না, তাঁর প্রাক্ শান্তিনিকেতন পর্বের কবিতাগুলিতে যে সজীবতা, যে স্বতঃস্ফূর্ততা লক্ষ করা যায়, পরবর্তী পর্বে তা যে অনেকটা অনুপস্থিত। এর কারণ হিসেবে বোধহয় আমরা ভাবতে পারি, শ্রীহট্ট - কাছাড়ের পর্বত - অরণ্যাবেষ্টিত যে পরিবেশ তিনি লালিত হয়েছিলেন, সেই পরিবেশটাই ছিল তাঁর কবিপ্রতিভার পক্ষে বিশেষ অনুকুল। তিনি নিজেও জানিয়েছেন 'পার্বত্য প্রকৃতির সম্মোহ', 'প্রাকৃত জীবনের প্রাণ' তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছে। তিনি জানিয়েছেন— 'আমার মধ্যে আজীবন মিশে আছে তিনটি বিভিন্ন সত্তা : একটি আদিম আরণ্যক, একটি প্রাকৃত গ্রামীণ আর একটি বিদগ্ধ নাগরিক। এদের মধ্যে আমার আরণ্যক সত্তার প্রভাবটাই বোধ করি প্রবলতম। অন্তত অনেক সময় তাই মনে হয় আমার। আধুনিক সভ্যতার আলোকে বাইরের ভব্য - সমাজে বেরোবার সময়ে খানিকটা যেন ভোল পালটিয়ে নেয় সে, কিন্তু তার ভিতরকার এই আদিম সত্তাটি এখানে রয়ে গেছে একেবারে প্রাথমিক অবস্থায়, সেখানে সে প্রকৃতির সঙ্গে আজও একাত্ম। প্রকৃতির রূপের ইন্দ্রজালে, অঙ্গের অরণ্যঘ্রাণে এবং স্পর্শের উন্মাদনায় তার আত্মার উল্লাস।'[২] তিনি আরও জানিয়েছেন , 'উত্তরে খাসিয়া ও জয়ন্তিয়া পাহাড়, দক্ষিণে পার্বত্য ত্রিপুরা আর পূবে ছত্রচূড়া বা ছাতাচূড়ার পাহাড়। ছাতাচূড়ার পুবদিকটা কাছাড় জেলা। আমার বাবা ও কাকা দুজনেই কাজ করতেন কাছাড়ের পার্বত্য অঞ্চলের দুটি পৃথক্ চা-বাগানে। তাঁদের কাছেই কেটেছে আমার ছেলেবেলা।...মা বাবার কাছে থাকার সময়ে— অর্থাৎ পাঁচ বছর বয়স অবধি — আমি যে-সব সমবয়সীদের সঙ্গে খেলাধুলো করেছি তাদের একদল ওই অঞ্চলেরই পাহাড়ি উপজাতির সন্তান, অন্যেরা পুবভারত থেকে আসা বিভিন্ন প্রদেশের শ্রমিক পরিবারের ছেলে।...কালাইন নদী পেরিয়ে পাকা এক ক্রোশ পাহাড়ি পথ ভেঙে যে-সব ছেলের সঙ্গে স্কুলে যেতাম প্রতিদিন, তাদের বেশির ভাগই ছিল মুন্ডা জাতের। কাজেই বুঝতে পারছ, গোড়া থেকেই পৃথিবী আমাকে দিয়েছিল প্রাকৃত জীবনের ঘ্রাণ।'[৩]

কবির এই আত্মবিশ্লেষণ এবং স্মৃতিচারণ থেকে বোঝা যায়, কবি - জীবনের প্রথম পর্বের পরিবেশ তাঁর পক্ষে কতখানি স্বাভাবিক ছিল। খুব সহজেই অনুমান করা যায়, তাঁর আদিম আরণ্যক সত্তাটির সহজ স্বাধীন বিচরণভূমি ছিল সেই পরিবেশ। শান্তিনিকেতনে যোগ দেবার পরে তাঁর কর্মজীবনের বিস্তার ঘটেছে, প্রত্যক্ষ পরিচয়ের সুযোগ ঘটেছে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত এবং ভারতবর্ষের বাইরের সঙ্গেও। কিন্তু তাঁর আদিম আরণ্যক সত্তাটি যেন কিছুটা ম্লান হয়ে গেছে বিদগ্ধ নাগরিক সত্তার চাপে। তাই পরবর্তীপর্বে শান্তিনিকেতনের প্রকৃতি তাঁর কবিতায় বারবার উঠে এলেও কোথায় যেন একটা ফাঁক থেকে যায়। শান্তিনিকেতনের পটভূমিতে লেখা একটি চমৎকার কবিতা 'ছুটির সকাল'। এই কবিতায় আছে—

লাল পথ, শালবীথি, সোনালি সকাল
জাদুকর শিল্পীর খেয়াল,
রঙের ফোয়ারা ছোটে গাছের মাথায়
রঙ ঝরে পাতায় পাতায়
আকাশের গা
রেখা টেনে পাখি উড়ে যায়।

(ছুটির সকাল, যেথা এই চৈত্রের শালবন)

শান্তিনিকেতনের প্রকৃতির স্নিগ্ধ সুন্দর এক টুকরো ছবি। এই ছবি আমাদের আকর্ষণ করে। তবু আদিম আরণ্যক অশোকবিজয় যেখানে অরণ্যপর্বতবেষ্টিত প্রকৃতির বর্ণনা দেবার সুযোগ পেয়েছেন সেখানে যেন তিনি আরও অনেক বেশি স্বচ্ছন্দ। যেমন—

ধূম্রদেহ হাফলং পাহাড়,

অতিকায় দনুর সন্তান
লাফ দিয়ে উঠে আছে অর্ধেক আকশে—
কোমরে জঙ্গল গোঁজা, সূর্যের মাকড়ি জ্বালে কানে,
দূর শুন্যে বল্লম উঁচানো—
(পাহাড়িয়া, রুদ্রবসন্ত)

পাহাড় এখানে অতিকায় দানব, যার কোমরে আছে জঙ্গল, যার কানে সূর্যের মাকড়ি এবং শূন্যে উঁচিয়ে আছে যার শীর্ষদেশ, যা একটি বল্লমরূপে চিত্রিত। অশোকবিজয় রাহার দুই পর্বের কবিতায় যতই তফাত থাকুক না কেন, তাঁর কবিতাকে যখন আমরা সামগ্রিকভাবে দেখি, তখন তাঁর সবচেয়ে বড় যে পরিচয়টি আমাদের সামনে ফুটে ওঠে, সেটি হল তাঁর চিত্রকর সত্তা। বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন ভাবে নানা মাপের, নানা রঙের ছবিতে তিনি ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন তাঁর দেখা জীবন ও জগৎকে। সেজন্য তাঁর আঁকা ছবি কেবলমাত্র বহিরঙ্গের চিত্রণ নয়, সেই ছবিতেই যেন তাঁর মনের কথাটি জড়িয়ে থকে ওতপ্রোতভাবে। ছবি সেখানে হয়ে ওঠে একটা মাধ্যম মাত্র। এ বিষয়ে তিনি নিজেও সচেতন ছিলেন। একবার তিনি বলেছিলেন, 'ভাব অর্থাৎ ইমোশনের দৃশ্যমান সিম্বল তৈরি করতে গিয়ে আমি এক-একসময় পাশাপাশি সাজিয়ে দিই কতকগুলো সিম্বলিক ছবির তাস।'[৪] কেমনভাবে তিনি সাজিয়ে দেন 'ছবির তাস' তা দেখে গেলে খুব বেশি অনুসন্ধান করতে হয় না। তাঁর বহু কবিতায় এই পদ্ধতির অনায়াস প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। যেমন—

মাথার উপর ডাকল পেঁচা, চমকে উঠি—আরে!
আধখানা চাঁদ আটকে আছে টেলিগ্রাফের তারে!
(একটি সন্ধ্যা, ভানুমতীর মাঠ)

টেলিগ্রাফের তারে আটকে যাওয়া চাঁদের এই দৃশ্য শুধুমাত্র আমাদের চোখের সামনে একটি ছবিই ফুটিয়ে তোলে না, তা আমাদের মনের গভীরে আমাদের মননকে আলোড়িত করে জাগিয়ে তোলে প্রকৃতি আর আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার সংঘাতের ব্যঞ্জনা।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিতে লেখা 'যুগসন্ধি' কবিতার শেষে যে ছবিটি এঁকেছেন তাতে বলা হয়ে গেছে অনেক কথাই। যমেন,

আকাশ তাকাই :
সেখানে শূন্যের বুকে চাপ চাপ ধোঁয়া আর ছাই,
হাতির শুঁড়ের মতো দেখি এক কদাকার হাত
রক্ত-ঝরা ডানা - ছেঁড়া দীর্ঘ এক শকুন - পালকে
পশ্চিমে সূর্যাস্থ- মেঘে করাল মহিষ - মুণ্ডা আঁকে।
(যুগসন্ধি, রক্ত-সন্ধ্যা)

পশ্চিমের সূর্যাস্ত- মেঘে ভয়ংকর মহিষমুণ্ডা আঁকছে একটি কদাকার হাত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রেক্ষিত জানা থাকলে এই ছবির নিহিত অর্থ আর আলাদা করে ব্যাখ্যা করতে হয় না। এই 'সিম্বলিক ছবির তাস' - এর খেলাতেই সব পরিষ্কার হয়ে যায়।

অশোকবিজয় তাঁর কবিতায় কীভাবে ছবি আঁকতেন অর্থাৎ তাঁর 'রসরূপায়নিক প্রক্রিয়াটি' ঠিক কীরকম ছিল তা আর একটু ভালোভাবে বুঝে নেওয়া যেতে পারে একটি কবিতাকে সামনে রেখে। এখানে আমরা তাঁর 'ফাল্গুন' কবিতাটি বেছে নিতে পারি।

ছিটকিনি নড়ে উপরের জানালায়
একটু কবাট ফাঁক,
চুড়ির ঝিলিকে একটু আলোর চিড়,—
দুইখানি সাদা হাত।
দুইটি কবাট দুই দিকে সরে যায়।
গোধূলির আলো পাখা ঝাপটায় চোখে মুখে বুকে এসে,
ধূ-ধু হাওয়া খেলে এলোচুলে, পর্দায়।

নদীর ওপারে আকাশে আবির - রঙ,
আলতা গলেছে জলে,
হাওয়া- জানালায় চোখে মুখে কাঁপে ঝিকিমিকি আবছায়া,

ধূ-ধু হাওয়া এলোচুলে,—

দূরে এক কোণে পলাশের ডালে আগুন লেগেছে চাঁদে।
(ফাল্গুন, ডিহাং নদীর বাঁকে)

মোট বারো লাইনের একটি কবিতা। প্রতিটি লাইনে ফুটে উঠেছে টুকরো ছবি। আর টুকরোগুলি মিলিয়ে একটা সমগ্র ছবি। ছবিগুলিকে আমরা কয়েকটি পর্যায়ে এইভাবে সাজাতে পারি :

প্রথম পর্যায়
১। উপরের জানালায় ছিটকিনি যেই উঠল।

২। জানালার ‘কবাট’ কিছুটা ফাঁক হতে দেখা গেল।
৩। হাতের চুড়িতে (নায়িকার) আলোর ছটা।
৪। দু-খানি ফর্সা হাত দৃষ্টিগোচর হল।
৫। জানালার ‘কবাট’ পুরোপুরি খুলে গেল। অর্থাৎ এবার শুধু হাত নয়, উন্মুক্ত জানালা দিয়ে নায়িকাকে যতখানি দেখা সম্ভব দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।
৬। তার চোখে মুখে বুকে ছড়িয়ে পড়ে গোধূলির আলো।
৭। হাওয়ায় এলোমেলো উড়ছে তার মাথার চুল।

দ্বিতীয় পর্যায়
১। নদীর ওপারে আকাশে ছড়িয়ে পড়েছে গোধূলির লাল রঙ।
২। নদীর জলেও রক্তিম আলোর প্রতিফলন।

তৃতীয় পর্যায়
১ জানালায় দাঁড়িয়ে থাকা নায়িকার চোখে মুখে আলোর ঝিকিমিকি, এলোচুলে খেলছে ধু-ধু হাওয়া।

চতুর্থ পর্যায়
১। দূরে দেখা যাচ্ছে পলাশের ডালের পাশে চাঁদ।

ছবিগুলি পর পর সাজাতে সাজাতে এসে চিত্রকর কবি তুলির শেষ টানটি দিলেন এইভাবে—

দূরে এক কোণে পলাশের ডালে আগুন লেগেছে চাঁদে।

এতক্ষণ টুকরো টুকরো ছবিতে যে-মোহ, যে-ভালোলাগার আবেশ তৈরি হচ্ছিল তা চূড়ান্ত হয়ে উঠল শেষ লাইনটিতে। পলাশ আর চাঁদ, আর আগুন কবির হাতে কামনামদির বসন্তের ‘সিম্বলিক তাস’ হয়ে উঠেছে এখানে। এই তাসের জাদুতে তিনি আমাদের আবিষ্ট করলেন, আমাদের দেখিয়ে দিলেন কেমন করে ‘পলাশের ডালে আগুন লেগেছে চাঁদে’।

সূত্রঃ-
১ অলোকবিজয় রাহা, পত্রাষ্টক, প্রথম প্রকাশ, কবি ও কবিতা প্রকাশন-৪
২ তদেব, পৃ. ১৬
৩ তদেব, পৃ. ৩৪-৩৫
৪ তদেব, পৃ. ১১